কৈফিয়ত

ইন দ্য হ্যান্ড অব তালেবান এক অর্থে লেখিকা ইভন রিডলির আত্মজীবনী নয়। আবার অন্য অর্থে এটি তার আত্মজৈবনিক এক অসামান্য দলিল। স্বভাবতই এ কথার মধ্যে একটা মতদ্বৈততা খুঁজে পাবেন পাঠকমাত্রই। এখানে মতদ্বৈততার তৈরি হয়েছে মূলত তালেবানের হাতে বন্দিবস্থায় তার স্থিতি এবং মুক্ত হয়ে তার ইসলাম গ্রহণের পটভূমির কারণে।

২০০১ সালে সাংবাদিক ইভন রিডলি যতোটা না আলোচিত হয়েছিলেন তালেবানের হাতে বন্দি হয়ে, তার চেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছিলেন মুক্তির কিছুদিন পর অকস্মাৎ ঘোষণা দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এটা পশ্চিম তো বটেই, অবাক করেছিলো আমার মতো প্রাচ্যের অনেক তরুণকেও। তখন থেকেই মুসলিম বিশ্বে ইভন রিডলি খুব পরিচিত একটি নাম। সত্যি বলতে, বর্তমানে মুসলিমদের কাছে পশ্চিমে তিনি অনেকটা অচেনা অভিভাবকের মতোই একজন।

ইসলাম গ্রহণের পর নানা কারণেই সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম হয়েছেন তিনি। কখনো ফিলিস্তিনের প্রতি নিজের অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে, কখনো ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষণ দিয়ে, কখনো বা জঙ্গিবাদ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করে। তিনি সবসময়ই আপন আলোয় ছিলেন স্বয়ম্ভর।

ইন দ্য হ্যান্ড অব তালেবান-এর নাম যখন থেকে শুনেছি তখন থেকেই ইচ্ছা ছিলো বইটি পড়ার। যখন পড়তে পারলাম তখন মনে হলো, এ বইটি বাংলাভাষী পাঠকের পাঠসম্ভারে যুক্ত করতে না পারলে একজন মুসলিম হিসেবে নিজের কাছেই অপরাধী হয়ে থাকবো। সেই প্রেরণা থেকেই বইটির অনুবাদ এবং সবিনয়ে জানিয়ে রাখছি, এটিই আমার অনূদিত প্রথম বই।

ধন্যবাদ *নবপ্রকাশ*কে বইটি অনুবাদের ভার আমার মতো নাবালকের হাতে অর্পণ করায় এবং আমার নড়বড়ে কলমের প্রতি আস্থা রাখায়। তাদের

নাইন ইলেভেনের বিস্মৃতি

মঙ্গলবার। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১। অন্যান্য স্বাভাবিক দিনের তুলনায় এই দিনটির তাৎপর্য অন্য রকম। আগামী ছয় সপ্তাহের জন্য রসদপাতি জোগাড়ের চিন্তা মাথায় থাকলেও মনে হচ্ছিল সামনে একটা শান্তিময় ভ্রমণ অপেক্ষা করছে। রবিবাসরীয় গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের সপ্তাহের মঙ্গলবারই যা একটু ফুরসত মিলে। নতুন বা পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আইভি বা কোয়াংলিনো রেস্টুরেন্টে ভরপেট খাওয়ার পরে গলির মুখে ছোট ছোট বারগুলোতে বিয়ারের বোতলে সুখ-দুঃখের গল্পে গল্পে সময় কেটে যায়।

তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবেও এই বুধবার আমাকে অফিসে ব্যস্ত সময় পার করতে হচ্ছে। হিসাবরক্ষকের বিশ্লেষণী চিন্তা আর হাতির মস্ত মাথার বুদ্ধি নিয়ে পাই পাই হিসাব মেলাতে হবে। অথচ কিছুদিন আগেও সংবাদপত্রের অফিসগুলোতে হিসাব মেলানোর দরকারই পড়েনি। নির্ধারিত খরচের বাইরে এক-দুই বেলা ঘুরে বেড়ানো কিংবা অভিজাত হোটেলে খাওয়া–এসব নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি কেউ। কিন্তু কৃচ্ছতার যুগে এসে চালাক হিসাবরক্ষকেরা বড় বড় টেবিল দখল করে বসে আছে। এ নিয়ে আমার দুঃখ হয়। বিশ্বকে নাড়িয়ে দেওয়া কতো প্রতিবেদন বা অন্তরালের খবরের জন্মই তো হয়েছে অলস দুপুরে কোনো রেস্তোরাঁর বেহিসাবি খাবারের পাত্রে।

বিনা বিচারে বন্দী একজনকে কথা দিয়েছি, তার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করবো। বেচারা দীর্ঘদিন ধরে মিথ্যা অভিযোগে কারাগারের চার দেয়ালে পচে মরছে। না, জেফরি আর্চার নয়। সত্যি সত্যি এমন একজন নিরপরাধ মানুষের সঙ্গে দেখা করব বলে কথা দিয়েছি।

প্রতিবেদকের কাজ করা সত্ত্বেও ঘড়ির কাঁটা ধরে আমার একদম কাজ এগোয় না। এই সপ্তাহেও দু-দুটি অবশ্যপালনীয় কাজের ভার ঘাড়ে চেপে বসেছিল। অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম চেয়ার-টেবিলে বসে থাকতে। কাগজ-কলমে নিমগ্ন চোখজোড়ায় জানালা দিয়ে বাইরে তাকানোর সময় পর্যন্ত

পাইনি। হায় দুপুরের খাবার! আচার আর পনির মাখানো স্যান্ডউইচে স্রেফ একটা কামড় বসাতে পারলেই খুশি হতাম।

তবে কাজে আমি একদমই ফাঁকি দিই না। এর জন্য অফিসে সহকর্মীদের সঙ্গে হালকা রসিকতার সময়গুলো উপভোগ করা সম্ভব হয় না। সন্ধ্যা হলেই সহকর্মীরা এক এক করে চলে গেলেও চাপিয়ে দেওয়া কাজ সম্পন্ন করতে একা একাই বসে থাকতে হয়।

ডেইলি এক্সপ্রেস-এর (লন্ডন) বার্তাকক্ষটা বিশাল হলঘরে অবস্থিত। সারি বেঁধে কাজে নিমগ্ন সবাই। এক কোনায় আমাদের কয়েকজন সহকর্মীর ডেস্ক অবস্থিত। সাংবাদিক, চিত্রগ্রাহক, প্রতিবেদক, শিল্পী–সব ধরনের লোকের বিশাল বাজার এই হলঘরে। বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরিয়ে প্রতি সপ্তাহে ব্ল্যাকফ্রায়ার ব্রিজের অদূরে ভোরবেলা প্রকাশিত হয় খবরের কাগজ। আমাদের সহকর্মীরা একে আদর করে ধূসর লুবায়েঙ্কা বলে ডাকে।

দুপুর কেবল মাথার ওপর চড়তে শুরু করেছে। এরই মধ্যে বার্তাকক্ষের টিভি সেটগুলোর সামনে একটু একটু করে ভিড় জমতে শুরু করল। ঘাড় ঘুরিয়ে টিভির পর্দায় জ্বলন্ত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে উত্তর দিকের টাওয়ারটায়।

লন্ডনে ঘড়ির কাঁটা তখনো দুইটায় পৌঁছায়নি। অস্থির হয়ে তখনই ফোন দিলাম ছোট বোন ভিভকে। নিউক্যাসলে একটা দোকানে কাজ করে ভিভ। তখনই টিভি পর্দায় তাকাতে বললাম ওকে।

মাত্র তিন সপ্তাহ আগেই আমরা নিউ ইয়র্কে ছিলাম। বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে ভিভের একটা চাকরি হয়েছিল তখন। তবে ভিভের কাছে উঁচু দালানের হাওয়া থেকে ফুলের ঘ্রাণ বেশি ভালো লাগে বলে আর বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রমুখী হয়নি সে।

যা-ই হোক, ভিভকে ফোনে বলছিলাম, বিমানের পাইলট হয়তো হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন। ঘটনার আকস্মিকতায় মাথায় অন্য কিছু আর আসছিল না। পরে অবশ্য এ রকম ভাবনার জন্য আফসোস হয়েছিল। উচিত ছিল চেয়ার থেকে উঠে পর্যবেক্ষণ কক্ষে গিয়ে সব সংবাদ চ্যানেলে একবার করে চোখ বোলানো।

নিউ ইয়র্কে থাকাকালীন আমি আর ভিভ ওয়াল স্ট্রিটের চাকচিক্যে বুঁদ হয়ে ছিলাম। আমরা উঠেছিলাম অভিজাত রিজেন্ট হোটেলে। পাঁচ তারকা হোটেলে অভিজাত চালচলন, রাজকীয় হালচালের মুখোশে নিজেদের প্রকাশ করতে খুব ভালো লাগত। বাণিজ্যিক এলাকার মধ্যে এটিই ছিল একমাত্র পাঁচ

তারকা মানের হোটেল। এককালে শেয়ারবাজারের বেচাকেনা চললেও বেশ কয়েকবার রিজেন্ট হোটেলের দালানটির খোলনলচে বদলে ফেলা হয়। এখন নিউ ইয়র্ক শহরের সবচেয়ে বড় বাথটাব এতে অবস্থিত। কী কপাল আমার, বোন ছাড়া সঙ্গ দেওয়ার মতো আর কেউই ছিল না সঙ্গে!

আমি আর ভিভ আমার ছোট মেয়ে ডেইজিকেও দেখতে গিয়েছিলাম। মেয়ের স্কুলের সামার ক্যাম্প চলছিল তখন। জায়গাটা নিউ ইয়র্ক থেকে ঘণ্টা দুয়েকের পথ। ওখানে ডেইজি অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছিল। প্রতিদিনই সে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছিল। ছয় সপ্তাহ ধরে চলে গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্প। গ্রীষ্মে ইংল্যান্ডে আমরা দুজন ছুটি কাটানোর চিন্তা করলেও এখানেই ডেইজি বেশি আনন্দে ছিল।

ওহ খোদা! ডেইজির চিন্তা আমাকে সবসময় একটা অজানা ভীতির মধ্যে রাখে। অথচ ও এখন আর কচি খুকি নয়। আটে পা দিয়েছে। আমিও চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই করছি। ডেইজি খুবই চমৎকার খুকি এবং নিজের যথেষ্ট যত্ন নিতে পারঙ্গম। কপালে থাকলে ওর সঙ্গে আরও সময় কাটাতাম। কিন্তু একক মা (সিঙ্গেল মাদার) বলে তা সম্ভব নয়। উপরন্তু সাংবাদিকতার চাকরি আমাকে একদমই অবসর নিতে দেয় না।

নিউ ইয়র্কের সুখকর স্মৃতির সঙ্গে টিভির পর্দার ভয়ংকর দৃশ্যগুলো একেবারেই যাচ্ছে না। ভিভ তো একদমই চমকে যায় আমার ধারাবিবরণী শুনে। কিছুক্ষণ পরই ওর স্বামীকে কল দেবে বলে ফোনটা রেখে দেয় ও। ভিভের স্বামী বিল ব্রাউনের অনেক সহকর্মী ও বন্ধুবান্ধব টুইন টাওয়ার বলে খ্যাত বিশ্ব বাণিজ্যকেন্দ্রে কর্মরত।

আমি অতিনাটকীয় দৃশ্য দেখেই যাচ্ছিলাম। তখনো টের পাইনি যে, বোস্টন বিমানবন্দর থেকে ছেড়ে আসা ১১ নং ফ্লাইটের বিমানটি, যেটি লস অ্যাঞ্জেলেসের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিল, সেটিকে জোর করে উত্তর টাওয়ারে আঘাত করা হয়। তখন নিউ ইয়র্কের ঘড়িতে বাজে ৮টা ৪৮।

১০ মিনিট পরে আমি আবারও ভিভকে ডায়াল করি। এইমাত্র আমার চোখের সামনে ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের ফ্লাইট নং ১৭৫, একটি বোয়িং-৭৬৭ বিশাল বিমান বিশ্ব বাণিজ্যকেন্দ্রের দক্ষিণ টাওয়ারেও আছড়ে পড়েছে। কথা বলার সময় লক্ষ করলাম ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছি। ভিভ সঙ্গে সঙ্গেই ফোন কেটে বিলকে ফোন দেয়।

হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে পড়লাম। বার্তাকক্ষের অনেকেই তখন দুপুরের খাবারের বিরতিতে বাইরে গেছে। আমাকে বের হয়ে নিউ ইয়র্ক যেতে হবে।

এটা ভয়াবহ নজিরবিহীন সন্ত্রাসী হামলা। প্রেসিডেন্ট কেনেডির হত্যাকাণ্ডের পরে আমেরিকার ইতিহাসে এত বড় সন্ত্রাসী হামলার নজির নেই।

দ্রুতই নিউ ইয়র্ক শহরতলির চিত্র বদলে যায়। বেলা ২টা ২৫-এর মধ্যেই সব রাস্তা আর সুড়ঙ্গপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রেসিডেন্ট বুশ এক বার্তায় একে আমেরিকার মাটিতে জঘন্য সন্ত্রাসী হামলা বলে ঘোষণা করেন।

নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের সব লেনদেন বন্ধ হয়ে যায়। আমেরিকার বিমানবন্দরগুলোতে বিমান ওঠা-নামা বন্ধ থাকে কিছুক্ষণ। কেউ একজন আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। অনেকেই একে বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন আমেরিকার পার্ল হারবারে রক্তক্ষয়ী হামলার সঙ্গে তুলনা করতে শুরু করেছে।

এরই মধ্যে টিভি পর্দায়, টেবিলে রাখা ল্যান্ডফোন ও মোবাইলে আমার দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে যায়। বার্তা প্রতিবেদক জিম মুরেকে বারবার ফোন করতে লাগলাম। সম্পাদক মার্টিনকেও কল দিলাম। আমি জানি, আমাকে এখনই ঊর্ধ্বশ্বাসে নিউ ইয়র্কে ছুটতে হবে।

বেলা পৌনে তিনটার দিকে ফ্লাইট-৭৭ পেন্টাগনে অবস্থিত সামরিক সদর দপ্তরের পঞ্চবাহুর একটিতে আঘাত হানে। এই সময়ের মধ্যে হোয়াইট হাউস খালি করে ফেলা হয়। চারপাশে মানুষজন চোখে-মুখে আতঙ্ক নিয়ে চতুর্থ আঘাতের ব্যাপারে শঙ্কা প্রকাশ করছে। ইতিমধ্যেই আরও একটি নিখোঁজ বিমানের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং সবাই ভাবছে এটি হোয়াইট হাউসেই আঘাত হানবে।

দুর্ভাগ্য, আমি এখনো প্রতিবেদককে ফোনে পাইনি। কিন্তু সহকারী প্রতিবেদক আমাকে শান্ত হতে বললেন। কারণ আজ মাত্র মঙ্গলবার। কিন্তু কী অদ্ভুত কথা, শতাব্দীর অন্যতম স্মরণীয় দুর্ঘটনা চোখের সামনে ঘটতে দেখলে কী করে শান্ত হয়ে বসে থাকা যায়?

আমি করুণ নয়নে দেখলাম, বাণিজ্য কেন্দ্রের ওপর হতে অফিসের কর্মীরা লাফ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। হায় খোদা! ওখানে নাকি ভয়ংকর দোজখের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যখন বেঁচে থাকার উপায় হলো উঁচু দালান থেকে নিচে লাফ দেওয়া। আমি এই দৃশ্য দেখতে চাইছিলাম না। আবার ঘটনার ভয়াবহতাকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারছিলাম না। এটা আমাকে বাধ্য হয়েই দেখতে হচ্ছে। সরাসরি ধ্বংসলীলা দেখানো হচ্ছে এবং এটি ভয়ংকর দৃশ্য। তা কল্পনার চেয়েও বেশি রক্ত হিমকারক।

একটু পরে জিম মুরে হন্তদন্ত হয়ে বার্তাকক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁর পিছু পিছু এলেন সম্পাদক মার্টিন। ঘটনার বিবরণ শোনার পর মার্টিন আমাকে